ফল ফসল

• আম	• সাতকরা
• কাঁঠাল	• আমড়া
• কলা	• জামরুল
• পেঁপে	• সফেদা
• আনারস	• কামরাঙ্গা
• পেঁয়ারা	• তৈকর
• কুল	• লটকন
• লিচু	• আমলকি
• নারিকেল	• আঁশফল
• কমলা	• রাম্বুতান
• লেবু	• স্ট্রবেরি
• বাতাবিলেবু	• বিলাতিগাব

ফল আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টির বিবেচনায় বাংলাদেশের ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। ফল বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সর্বোত্তম উৎস। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া হয় বিধায় এতে বিদ্যমান সবটুকু পুষ্টি গ্রহণ করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন ফলে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধকারী উপাদান এন্থোসায়ানিন ও লাইকোপেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফলের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় মাত্র ১-২% জমি রয়েছে। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের ১০% আসে ফল থেকে।

বাংলাদেশ একটি আর্দ্র ও অব-উষ্ণ মন্ডলীয় দেশ। এখানে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, সফেদা, জাম, লটকন, আনারস, লিচু, লেবু জাতীয় ফল, পেঁয়ারা, নারিকেল, আমড়া, তেঁতুল, বেল, আতা, শরীফা ইত্যাদি ফল ভাল জন্মে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল উৎপাদিত না হওয়ায় এর চাহিদা ও দাম বেশি থাকে। অন্যান্য শস্যের চেয়ে ফলের দাম সাধারণত বেশি হয় বলে ফল চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা যায় তবে উৎপাদন মৌসুমের পরে সংরক্ষিত ফল অধিক দামে বিক্রি করা সম্ভব। অথবা উদ্বৃত্ত ফল ও ফলজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তাই অধিক চাহিদার কারণে দেশে অধিক ফল উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

আম

আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয়। জলবায়ু ও মাটির অধিক উপযোগিতার কারণে উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদন প্রধানত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সব অঞ্চলে অনেক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস আম। তবে বর্তমানে চাষোপযোগী উন্নত জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় এসব অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য জেলাতেও বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন শুরু হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আমের মোট উৎপাদন প্রায় ৮.২৮ লক্ষ মে. টন। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান ও ব্যবহার বৈচিত্রে আম তুলনাহীন। পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন 'এ' এবং খনিজ পদার্থ থাকে। ভিটামিন 'এ'-এর দিক থেকে আমের স্থান পৃথিবীর প্রায় সকল ফলের উপরে।

ফলসহ আমের গাছ

আমের জাত

বারি আম-১ (মহানন্দা)

'বারি আম-১' প্রতিবছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাত। আমের এই আগাম জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতার আকৃতি লম্বাটে।

পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল প্রায় গোলাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৭.৬ সেমি, প্রস্থ ৬.৭ সেমি, পুরুত্ব ৫.৯ সেমি। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় হলদে। ফলের ওজন ১৯০-২১০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%) এবং শাঁস ফলের ৭০%। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ।

প্রতিবছর নিয়মিত ফল দেয়। মাঘ মাসে (মধ্য-জানুয়ারি হতে মধ্য-ফেব্রুয়ারি) গাছে ফুল আসে। ফল আহরণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন। বাংলাদেশে সর্বত্রই মহানন্দা চাষ করা যায়। তবে ফলের বোঁটা শক্ত ও ঝড়ো হাওয়া সহনশীল বিধায় দেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মহানন্দা রপ্তানিযোগ্য জাত বলে এর বাগান করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

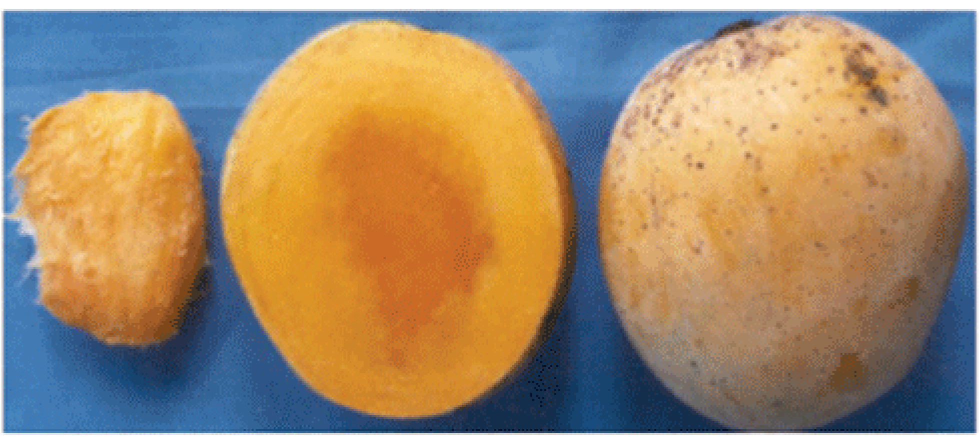

বারি আম-১ (মহানন্দা)

বারি আম-২

'বারি আম-২' প্রতিবছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রঙ্গিন উচ্চ ফলনশীল জাত। দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের আম দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, ত্বকের রং গাঢ় হলদে। এ জাতের আম কেটে ফালি করে খাওয়া যায়। 'বারি আম-২' জাতটি মাঝ-মৌসুমী। ফুল আসার সময় ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহ (জুনের ৩য় সপ্তাহ)।

ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৯.৭৫ সেমি, প্রস্থ ৭.২৫ সেমি এবং পুরুত্ব ৬.১০ সেমি। ফলের ওজন ২৪০-২৬০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও কম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৭.৫০%) এবং শাঁস ফলের ৬৯%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২ টন। জাতটি বাংলাদেশে সর্বত্রই চাষের উপযোগী। এটি একটি রপ্তানিযোগ্য জাত।

বারি আম-২

বারি আম-৩ (আম্রপালি)

দেশের আম জগতে আম্রপালি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তন। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে উপযোগিতা যাচাইয়ের পর চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। পাতার আকৃতি ডিম্বাকার বর্ষাকৃতির, পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির হয়। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৮.৩ সেমি, প্রস্থ ৬.০ সেমি এবং পুরুত্ব ৫.৮ সেমি। পাকলে হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। ফলের ওজন ২১০-২২০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা রঙের হয়। ফল পাকলে সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত বেশ মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৪০%) হয়। আঁশহীন, মধ্যম রসালো, শাঁস ফলের ৭১%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ।

প্রতিবছর ফলদানকারী নাবী জাত। ফুল আসে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ), ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ৩য় সপ্তাহ (জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৩

বারি আম-৪ (হাইব্রিড আম)

দীর্ঘদিন চেষ্টা করে সংকরায়ণের মাধ্যমে 'বারি আম-৪' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ হাইব্রিড জাতটি উদ্ভাবনে ফ্লোরিডার এম-৩৮৯৬ জাতটিকে পুরুষ ও দেশীয় আশ্বিনা জাতটি স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে।

এটি নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মিষ্টি স্বাদের নাবী জাত। ফজলী আম শেষ হওয়ার পর এবং আশ্বিনা আমের সাথে অর্থাৎ মধ্য শ্রাবণ থেকে শ্রাবণের শেষে (জুলাই শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট ১ম সপ্তাহ) এ জাতের আম পাকে। আশ্বিনা আম বড় হলেও খেতে টক ভাবাপন্ন বিধায় তেমন কদর নেই। অথচ 'বারি আম-৪' এর ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকৃতি, শাঁস হলদে, খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪.৫%)। এ জাতের আম কাঁচা অবস্থাতেও খেতে মিষ্টি। আমের শাঁস দৃঢ় হওয়ায় পাকার পরও বেশ কয়েকদিন ঘরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন ও রসালো। আঁটি ছোট ও খোসা পাতলা, শাঁস ফলের ৮০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

বারি আম-৫

দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ২০১০ সালে 'বারি আম-৫' নামে অনুমোদন করা হয়। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। আমের বাণিজ্যিক জাত গোপালভোগেরও আগে পাকে। আমের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করতে জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে (মে মাসের ৩য় সপ্তাহ) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (১৯% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

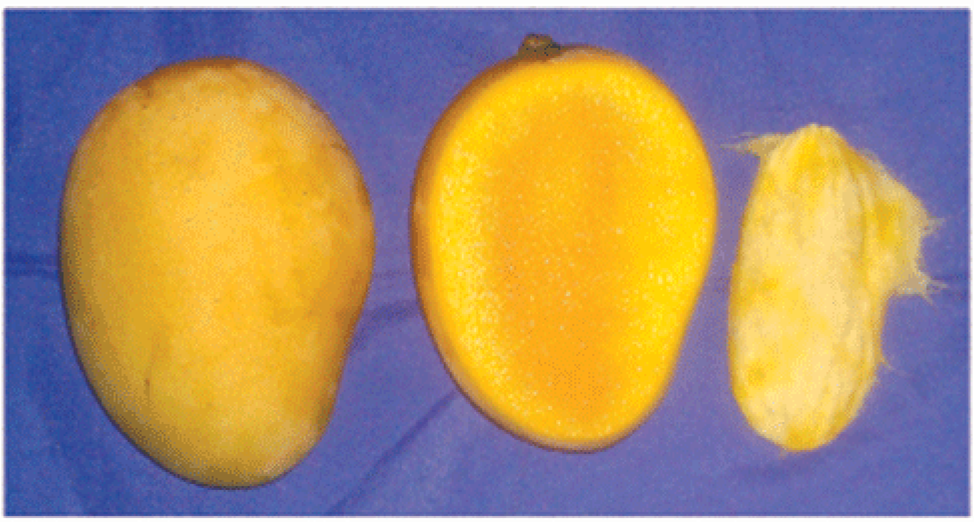

বারি আম-৫

বারি আম-৬

'বারি আম-৬' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি মধ্য-মৌসুমী জাত। প্রদর্শণীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি নিয়মিত ফলধারী একটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম খাড়া।

ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের, গড় ওজন-২৮০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৯ সেমি ও প্রস্থে ৯.৫ সেমি, পুরুত্বে ১১.৩ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁসের রং হলুদ, স্বাদে মিষ্টি (টিএসএস ২১%), শাঁস আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৪০ গ্রাম, খোসার ওজন ৪২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭২% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬ টন।

বারি আম-৬

বারি আম-৭

বারি আম-৭

'বারি আম-৭' বিএআরআই উদ্ভাবিত একটি রঙিন মাঝ মৌসুমী জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু, উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রং ও ভাল গুণাবলীর জন্য এ জাতের আম বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।

গাছ মধ্যম আকৃতির, মধ্যম ছড়ানো। আমের বাণিজ্যিক জাত ল্যাংড়ার পরে পাকে। ফল গোলাকার, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৯০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৫ সেমি ও প্রস্থে ৮.১ সেমি, পুরুত্বে ৬.২ সেমি। পাকা ফলের রং লাল আভাযুক্ত হলুদ ও শাঁসের রং হলুদ। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৮%), শাঁস হালকা আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৩৩ গ্রাম, খোসার ওজন ৩২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৭% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা খুব ভাল (৯-১১ দিন)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৭

বারি আম-৮

'বারি আম-৮' বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রূণী (পলিএম্ব্রায়োনিক) নাবী জাত। পাহাড়ী এলাকা হতে সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

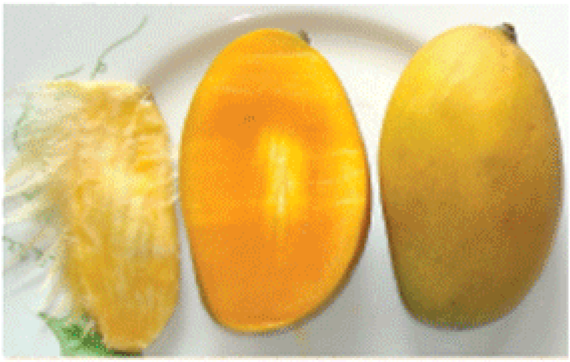

বারি আম-৮

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। প্রতিবছর ফল দেয় এবং জাতটি ফজলী আমের সাথে পাকে। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, লম্বায় ১১.৩ সেমি ও প্রস্থে ৭.০ সেমি, পুরুত্বে ৬.০ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁস কমলা বর্ণের, স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ২২%), শাঁস আঁশ বিহীন, আঁটির ওজন ২৬ গ্রাম, খোসার ওজন ৫০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭০% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫-৭ দিন বেশি, জাতটি পলিএম্ব্রায়োনিক হওয়ায় বীজ থেকে মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন চারা উৎপাদন করা যায়। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

প্রতিবছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। গাছ বড় ও মধ্যম খাড়া। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। সাত বছর বয়স্ক গাছে হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৩৫ টন। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

বারি আম-১০

উচ্চ ফলনশীল, মাঝ মৌসুমী জাত। প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ১০-১২ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ২৯০টি ফল ধরে যার ওজন ৭২.৫ কেজি। ফল আঁশ বিহীন এবং খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৬%)। ফল মাঝারী আকৃতির এবং গড় ওজন ২৫০ গ্রাম।

ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ২য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৬৪ ভাগ। এ জাতের আমে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি আম-১০

আমের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি

চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর)।

চারা রোপণের দূরত্ব

৮ থেকে ১০ মিটার।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
জৈব সার	২০-৩০ কেজি
টিএসপি	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
এমওপি	২০০-৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-২৩০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১৫	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমওপি(গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৪০০	৫০০	৮০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫
বরিক এসিড	২০	২০	৩০	৩০	৪০	৫০

উল্লিখিত সার ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় মুকুল বের হওয়ার ৩ মাস আগে থেকে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোঁটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আবার ১ বার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের প্রধান কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে ১ থেকে ১.৫ মিটার ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হয়।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলম গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

গাছে কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ করে তখন আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাকি দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে জালিযুক্ত বাঁশের সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভাল।

অন্যান্য পরিচর্যা

আমের হপার পোকা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন

শোষক পোকা (হপার) এবং এনথ্রাকনোজ রোগ আমের প্রধান শত্রু। বিভিন্ন পর্যায়ে এরা আমের ক্ষতি করে থাকে। তবে মুকুল অবস্থায় ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে শতভাগ ফসল বিনষ্ট হতে পারে। মুকুল আসার সময় শোষক পোকা (হপার) এবং এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে ফুল ঝরে যায়।

আমের হপার পোকা

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত আম

প্রতিকার

পরাগায়ণ নিশ্চিত করতে হবে। আমের মুকুল এসেছে কিন্তু ফুল ফোঁটার পূর্বেই অর্থাৎ পুষ্পমঞ্জরী ছড়ার দৈর্ঘ্য ৫-১০ সেমি হয় তখন প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি ১ মিলি এবং টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে একবার এবং তার একমাস পর আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আমের ভোমরা পোকা দমন

আমের ভোমরা পোকার কীড়া আমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায়। সাধারণত কচি আমে ছিদ্র করে এর ভিতরে ঢুকে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য বাইরে থেকে আমটি ভাল মনে হলেও ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। একবার কোন গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী গাছসমূহে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কলমের আম গাছে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকার

- মুকুল আসার পূর্বে পৌষ-মাঘ মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়।
- আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে।
- ফলের মার্বেল অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/ বাসাথ্রিন) ১০ ইসি মিশিয়ে গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অন্যান্য প্রযুক্তি

অনুন্নত আম গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর

টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে অনুন্নত আম গাছকে সহজেই উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়। এ জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুন্নত আম গাছের সমস্ত প্রশাখা কেটে দিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে কর্তিত প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ডালসমূহে ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কলম করতে হবে। কলমের নিচ থেকে কুশি বের হলে সেগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। এভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে অনুন্নত আম গাছটি উন্নত জাতে রূপান্তরিত হবে।

গরম পানিতে আম শোধন

গাছ থেকে আম সংগ্রহের পর পরই আম ৫২-৫৫° সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে শোধনের মাধ্যমে বোঁটা পচা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন করে আমের সংরক্ষণকাল অতিরিক্ত এক সপ্তাহ বাড়ানো যায় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ করা সম্ভব। গরম পানিতে আম শোধনের একটি যন্ত্রও (হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা ও শোধনের সময় ঠিক রেখে প্রতি ঘণ্টায় ১ টন আম শোধন করা যায়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় প্রতি কেজি আমের শোধন খরচ ৪০-৫০ পয়সা।

শোধনকৃত আম অশোধনকৃত আম

কাঁঠাল

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। কাঁঠাল আকারের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয় তবে ঢাকার উঁচু অঞ্চল, সাভার, ভালুকা, ভাওয়াল ও মধুপুর গড়, বৃহত্তর সিলেট জেলার পাহাড়ি এলাকা, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় সর্বাধিক পরিমাণে কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাঁঠালের মোট উৎপাদন ৯.৭৫ লক্ষ মে. টন।

কাঁঠালে প্রচুর শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন 'এ' রয়েছে। দামের তুলনায় এত বেশি পুষ্টি উপাদান আর কোন ফলে পাওয়া যায় না। কাঁচা ফল তরকারি, পাকলে ফল হিসেবে এবং বীজ ময়দা ও তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ ভেজেও খাওয়া যায়।

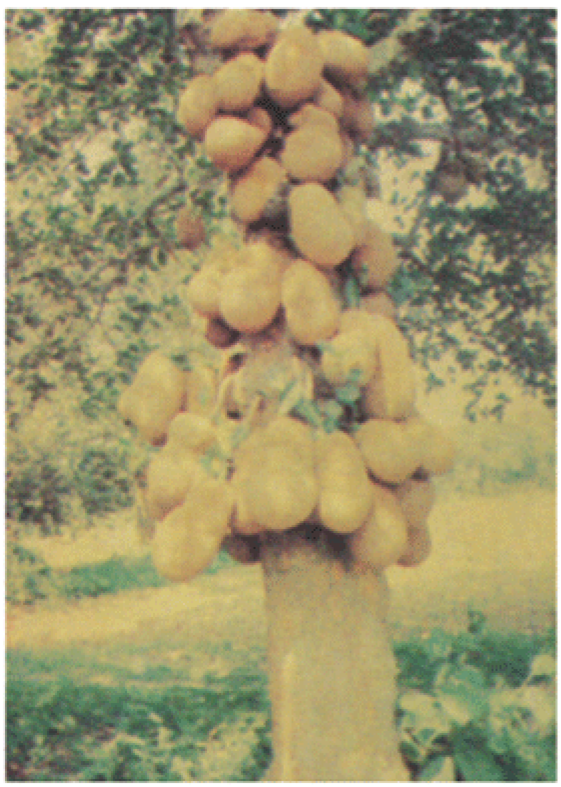

কাঁঠালসহ গাছ

কাঁঠালের জাত

বাংলাদেশে যে কাঁঠাল উৎপন্ন হয় শাঁসের বুনট (Flesh texture) অনুযায়ী সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন- খাজা, আদরসা বা দুরসা ও গালা।

বারি কাঁঠাল-১

'বারি কাঁঠাল-১' জাতটি স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত। ফল মধ্য-মে মাসে পরিপক্কতা লাভ করে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০০-১২৫টি।

এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি ফলন ১১৮০ কেজি (১১৮ টন/হেক্টর)। মধ্যম আকারের প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯.৫ কেজি। ফল ডিম্বাকার ও খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫%। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও অত্যন্ত রসালো, নরম এবং দুরসা প্রকৃতির ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২%)। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী।

বারি কাঁঠাল-১

বারি কাঁঠাল-২

'বারি কাঠাল-২' জাতটি স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০১১ সালে অনুমোদন করা হয়।

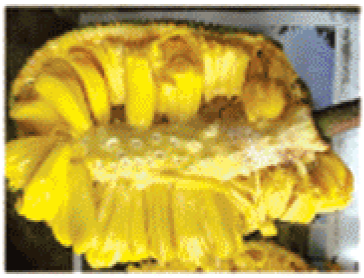

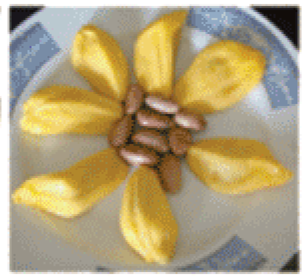

বারি কাঁঠাল-২ এর শাঁস

এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল অমৌসুমী জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি ৫৪-৭৯টি ফল ধরে যার ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি। ফল মাঝারী (৬.৯৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২১%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮-৫৮ টন। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি কাঁঠাল-২

কাঁঠালের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি ও মাটি

কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল ও কাকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়। অম্লীয় মাটিতে কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

বংশ বিস্তার

সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকেই চারা তৈরি করা হয়। যদিও এতে গাছের মাতৃ বৈশিষ্ট্য হুবহু বজায় থাকে না তথাপি ফলনে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপন করলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে। দশ থেকে বার মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এছাড়া অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি, যেমন- ফাটল কলম (Cleft grafting), চারা কলম (Epicotyle grafting) এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

চারা রোপণের সময়

চারা বা কলম রোপণের সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ (জুন-আগস্ট) মাস।

চারা রোপণের দূরত্ব

গাছ ও সারির দূরত্ব হবে ১০ × ১০ মিটার। হেক্টরপ্রতি গাছের সংখ্যা ১০০টি। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে ১ × ১ × ১ মিটার গর্ত তৈরি করে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

গর্তে সারের পরিমাণ

সারের নাম	গর্তপ্রতি সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	২৫-৩৫ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ গ্রাম
এমওপি	২৪০-২৬০ গ্রাম

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। প্রয়োজনমত পানি সেচ ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

ছোট অবস্থায় চারা/কলম লাগানোর পর অপ্রয়োজনীয় ছোট ছোট শাখা প্রশাখা কেটে দিলে কাণ্ড তৈরিতে সহায়ক হয়। বড় গাছের মরা ডাল, অন্তরের ছোট ছোট শাখা প্রশাখা এবং পূর্ববর্তী বছরের ফলের বোঁটার অবশিষ্ট অংশ প্রুনিং করে দিলে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বড় ডাল কাটা গাছের জন্য ক্ষতিকর।

গাছে সার প্রয়োগ

কাঁঠাল গাছে বছরে দু'বার সার প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম কিস্তি বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং পরবর্তী কিস্তি বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। নিম্নের ছকে কাঁঠাল গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১ বছর	২০-৩০	২০০	৩০০	২০০	১০০
২-৪ বছর	৩০-৪০	৪০০	৫০০	৩০০	২০০
৫-৭ বছর	৪০-৫০	৬০০	৭৫০	৪০০	৩০০
৮-১০ বছর	৫০-৬০	৮০০	১০০০	৬০০	৪০০
১১-১৫ বছর	৬০-৭৫	১২০০	১২৫০	৮০০	৫০০
১৫ বছরের উর্ধে	১০০	২০০০	১৫০০	১০০০	৫০০

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর রূপান্তরিত বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিলে কচি ফল ঝরা কমে, ফলন ও ফলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্বল্প সময়ের জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়। এজন্য বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ফল ব্যাগিং

গাছে ফল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিচের দিকে খোলা পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিলে ফল ছিদ্রকারী পোকা ও নরম পচা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ফলের রং ও আকার আকর্ষণীয় হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

নরম পচা রোগ

রাইজোপাস অটোকারপি নামক ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের মুচি বা ফল পচা রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামী রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

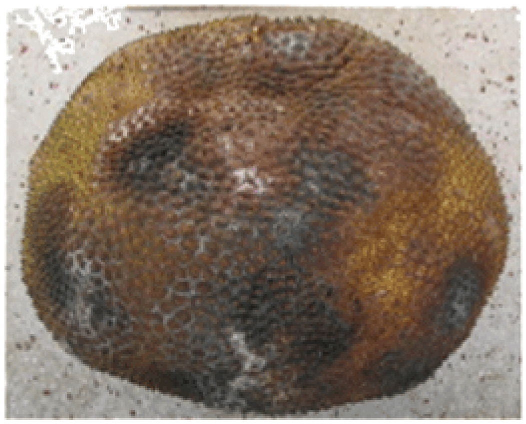

নরম পচা রোগাক্রান্ত কাঁঠাল

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প মঞ্জরী সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- মুচি ধরার আগে ও পরে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার ব্যাভিস্টিন/ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫/রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর হতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গামোসিস

এ রোগের প্রভাবে গাছের বাকলে ফাটল ধরে ও ফাটলের স্থান থেকে অবিরত রস ঝরে। কাঠ বেরিয়ে আসে, ক্ষতস্থানে গর্ত হতে থাকে ও পচন ধরে। চারা গাছ সংবেদনশীল বিধায় ধীরে ধীরে মারা যায়।

গামোসিস রোগে আক্রান্ত গাছ

প্রতিকার

- ক্ষতস্থান বাটাল বা ধারালো ছুরি দিয়ে চেছে (স্ক্রপিং) উক্তস্থানে বর্দোপেস্ট/আলকাতরা লেপন করতে হবে। প্রথমবার দেয়ার পর পরবর্তী দু'মাসে আরো দু'বার লেপন করা প্রয়োজন।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা কাঁঠালের অন্যতম প্রধান শত্রু। এ পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে গাছের অভ্যন্তরে ঢুকে এবং কাণ্ডের কেন্দ্র বরাবর খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সময়মত দমন করা না গেলে আক্রান্ত ডাল বা সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দ্বারা আক্রান্ত কাণ্ড

প্রতিকার

- ছিদ্রের ভিতর চিকন রড ঢুকিয়ে পোকার কীড়া মেরে ফেলতে হবে।
- চিকন রড দিয়ে ছিদ্র পরিষ্কার করে এর অভ্যন্তরে কেরোসিন, পেট্রোল বা উদ্বায়ী কীটনাশক সিরিঞ্জের মাধ্যমে ঢুকিয়ে কাদা বা মোম দিয়ে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিলে অভ্যন্তরে ধুয়া সৃষ্টি হয় এবং পোকা মারা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকা কাঁঠালের আর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার কীড়া বাড়ন্ত ফলের গা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত ফল বেঁকে বা ফেটে যায় এবং বৃষ্টির পানি ঢুকে ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দ্বারা আক্রান্ত কাঁঠাল

প্রতিকার

- আক্রান্ত পুষ্প মঞ্জরী ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বাগান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- বাড়ন্ত ফল নিচের দিকে খোলা পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।
- ফুল আসার সময় সুমিথিয়ন বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

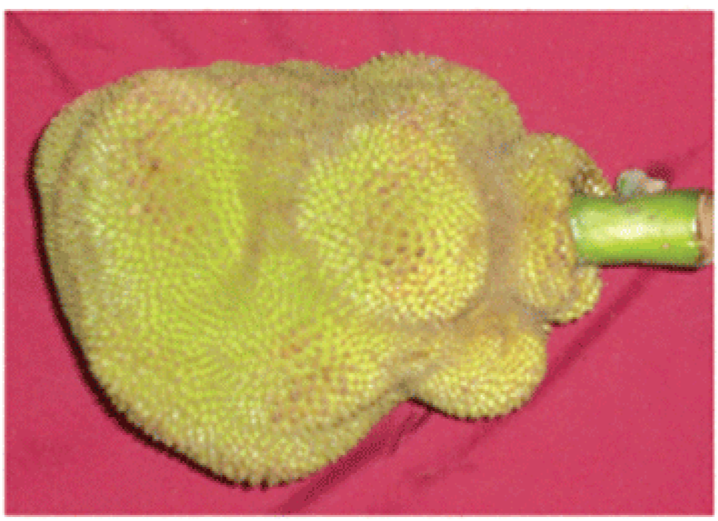

কাঁঠালে বোরনের অভাব জনিত লক্ষণ

কলা

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। কলা বাংলাদেশের প্রধান ফল যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকলেই খাওয়ার সুযোগ পায়। বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫৪ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ৮.৩৬ লক্ষ মে. টন। কলার হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫.৬০ টন। কলা ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ ও সুগন্ধী এবং পুষ্টিকর ফল। ফলন অন্যান্য ফল ও ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি।

ধান, গম ও মিষ্টি আলুর চাষ করে প্রতি হেক্টরে যেখানে ১১.২, ৬.৬ ও ৩৯.৮ লক্ষ কিলো ক্যালরি খাদ্য-শক্তি উৎপন্ন হয় সেখানে কলা থেকে প্রায় ৫০.০ লক্ষ কিলো ক্যালরি পাওয়া যায়। কলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে সারা বছরই উৎপন্ন হয়।

কলা বাগান

বারি কলা-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০০ সালে 'বারি কলা-১' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল পাকা কলার জাত উদ্ভাবন করেছে।

এ জাতের গাছ অমৃত সাগর জাতের গাছের চেয়ে ছোট অথচ ফলন দেড় থেকে দুই গুণ বেশি। কাঁদিপ্রতি গড় ফলন ২৫ কেজি। কাঁদিতে ৮-১১টি ফানা থাকে। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের কাঁদিতে ১৫০-২০০টি কলা পাওয়া যায়। দেখতে অমৃতসাগর ও মেহেরসাগর কলার মতই। পাকা কলা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ও খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪%)। ফলের গড় ওজন ১২৫ গ্রাম। গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রায় পাকা কলা অমৃত সাগর ও মেহের সাগর জাতের কলার মত বেশি দিন ঘরে রাখা যায় না। আবার শীতকালে এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি। রোপণের ১১-১২ মাসের মধ্যে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

জাতটি বানচি টপ ভাইরাস ও সিগাটোকা রোগের প্রতি সংবেদনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৬০ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি কলা-১

বারি কলা-২

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পানামা ও সিগাটোকা রোগ প্রতিরোধী এবং উচ্চ ফলনশীল কাঁচকলার এ জাতটি ২০০০ সালে 'বারি কলা-২' নামে উদ্ভাবন করেছে। এটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত একটি সংকর জাত (FHIA-03)।

গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারী আকারের। এ জাতের গাছে সাকারের সংখ্যা কম (২-৩টি)। রোপণের পর ১১-১২ মাসের মধ্যে ফল আহরণের উপযুক্ত হয়। কলার কাঁদির ওজন ১৫-২০ কেজি। কাঁদিতে কলার সংখ্যা ১০০-১৫০টি। কলা আকারে মাঝারী এবং গাঢ় সবুজ রঙের।

ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি কলা-২

বারি কলা-৩

বাংলা কলার উচ্চ ফলনশীল জাতটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৫ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রতি কাঁদিতে ১৪০-১৫০টি কলা হয় যার ওজন ২৩-২৫ কেজি। ফল মধ্যম আকারের (১০০ গ্রাম)। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন। পাকা ফল হলুদ রঙের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৫.৫%) এবং খেতে সুস্বাদু।

ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষোপযোগী।

বারি কলা-৩

বারি কলা-৪

পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত চাপা কলার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৬ সালে মুক্তায়ন করা হয়। প্রতি কাঁদিতে ফলের সংখ্যা ১৭৮টি যার ওজন প্রায় ১৯ কেজি। ফল মাঝারী আকারের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম।

পাকা ফল হলদে রঙের সম্পূর্ণ বীজ বিহীন এবং টক মিষ্টি (বিক্রমান ২০%) স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৪৫ টন। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৪

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ও গর্ত খনন

জমি ভালভাবে গভীর করে চাষ করতে হয়। দেড় থেকে দুই মিটার দূরে দূরে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারের গর্ত খনন করতে হয়। চারা রোপণের মাসখানেক আগেই গর্ত খনন করতে হয়। গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে।

রোপণের সময়

কলার চারা বছরে ৩ মৌসুমে রোপণ করা যায়।

প্রথম রোপণঃ আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর)।

দ্বিতীয় রোপণঃ মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য-জানুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ)।

তৃতীয় রোপণঃ চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-মে)।

চারা রোপণ

রোপণের জন্য অসি তেউড় (Sword sucker) উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো। অনেকটা তলোয়ারের মত, গুড়ি বড় ও শক্তিশালী এবং কাণ্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত খাটো জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সেমি ও লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউর ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া টিস্যু কালচার চারা ব্যবহার করা হলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ
জৈব সার	১৫-২০ কেজি
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমওপি	৬০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের ৫০% গোবর, টিএসপি ও জিপসাম জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০% গোবর, টিএসপি ও জিপসাম এবং ২৫% এমওপি গর্তে দিতে হয়। রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর ২৫% ইউরিয়া ও ২৫% এমওপি জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিত হবে। এর ২ মাস পরপর গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম এমওপি ও ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার পর এই পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে।

পরিচর্যা

চারা রোপণের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে তখনই সেচ দেওয়া উচিত। এ ছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় কলা বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে তার জন্য নালা থাকা আবশ্যক। মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন তেউর রাখা উচিত নয়। মোচা আসার পর গাছপ্রতি মাত্র একটি তেউড় বাড়তে দেয়া ভাল।

ফসল সংগ্রহ

ঋতুভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলাই পরিপক্ক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করলে কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। সাধারণত মোচা আসার পর ফল পুষ্ট হতে ২$^{১}/_{২}$- ৪ মাস সময় লাগে। কলা কাটানোর পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

কলার পানামা রোগ ব্যবস্থাপনা

এটি একটি ছত্রাকজনিত মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তী সময় পাতা বোঁটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চতুর্দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যায়। অভ্যন্তরিণ লক্ষণ হিসেবে ভাসকুলার বান্ডেল হলদে-বাদামী রং ধারণ করে।

কলার পানামা রোগাক্রান্ত বাগান

প্রতিকার

- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের তেউড় রোপণ করা যাবে না।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ৩-৪ বছর কলা চাষ করা যাবে না।

কলার সিগাটোকা রোগ দমন

এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় বা ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। ক্রমশ দাগগুলো বড় হয় ও বাদামী রং ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

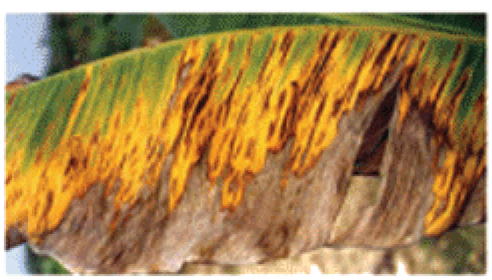

কলার সিগাটোকা রোগাক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

- আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর গাছে ছিটাতে হবে।

কলার বানচি-টপ ভাইরাস রোগ ব্যবস্থাপনা

এ রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্ত এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাঁকানো এবং সামান্য হলুদ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার মধ্য শিরা ও বোঁটায় ঘন সবুজ দাগ দেখা যায়। পাতার শিরার মধ্যে ঘন সবুজ দাগ পড়ে।

প্রতিকার

- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছ উঠানোর আগে জীবাণু বহনকারী 'জাব পোকা' ও 'থ্রিপস' কীটনাশক ঔষধ দ্বারা দমন করতে হবে। সুস্থ গাছেও কীটনাশক ঔষধ (সেভিন) স্প্রে করতে হবে।

কলার বানচি-টপ ভাইরাস রোগাক্রান্ত গাছ

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা

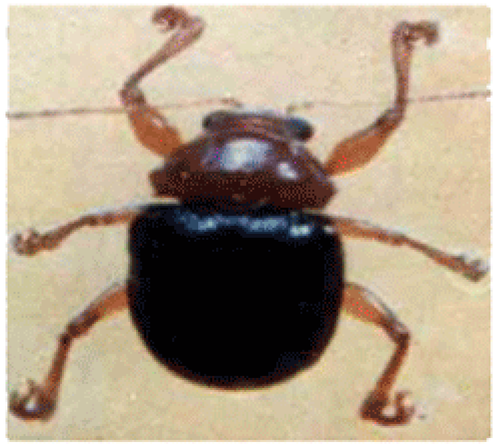

বিটল পোকা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা কলার কচি পাতায় হাটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। কলা বের হওয়ার সময় হলে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার উপর হাঁটাহাটি করে এবং রস চুষে খায়। ফলে কলার গায়ে বসন্ত রোগের দাগের মত দাগ হয়। এসব দাগের কারণে কলার বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার

- পোকা-আক্রান্ত মাঠে বার বার কলা চাষ করা যাবে না।
- কলার মোচা বের হওয়ার সময় ছিদ্রবিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- প্রতি ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউ পি মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার গাছের পাতার উপরে ছিটাতে হবে। ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি হারে ব্যবহার করতে হবে।

বিটল পোকা আক্রান্ত কলা

পেঁপে

পেঁপে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফল। বাংলাদেশেও পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত এটা স্বল্পমেয়াদী, দ্বিতীয়ত ইহা কেবল ফল নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধী গুণ সম্পন্ন। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও যশোহরে উৎকৃষ্ট মানের পেঁপে উৎপন্ন হয়। এদেশে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন প্রায় ৪৮ হাজার টন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৭ টন।

আমের পরই ভিটামিন 'এ' এর প্রধান উৎস হল পাকা পেঁপে। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পেপেইন নামক হজমকারী উপাদান থাকে।

পেঁপেসহ গাছ

পেঁপের জাত

শাহী পেঁপে

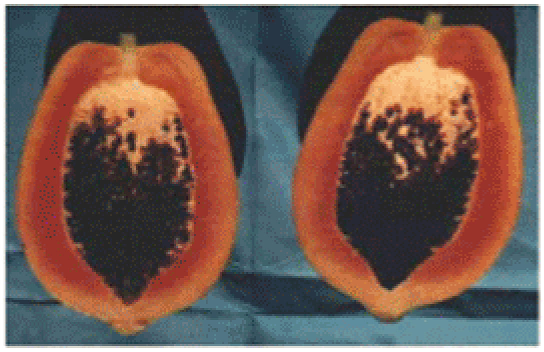
শাহী পেঁপে

রাজশাহী অঞ্চল হতে সংগৃহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেঁপের উন্নত জাত 'শাহী পেঁপে' উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয়। শাহী পেঁপে একটি এক লিঙ্গিক জাতের পেঁপে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ধরে। স্ত্রী গাছের প্রতিটি পত্র কক্ষের একটি বোঁটায় ৩টি করে স্ত্রী ফুল আসে। অপর পক্ষে পুরুষ গাছে লম্বা বোঁটায় একসঙ্গে অনেক পুরুষ ফুল ধরে। গাছ হালকা সবুজ বর্ণের। তবে পাতার রং গাঢ় সবুজ। চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে।

ফলসহ শাহী পেঁপের গাছ

কাণ্ডের খুব নিচু হতে ফল ধারণ শুরু হয়। ফুল আসার ৩-৪ মাস পর পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। জাতটি দেশের সর্বত্রই চাষোপযোগী।

গাছের উচ্চতা ১৬০-২০০ সেমি, পাতার সংখ্যা ১৭-২০টি, পাতার বোঁটার দৈর্ঘ্য ২৪-২৮ সেমি, পাতার দৈর্ঘ্য ২৩-২৭ সেমি এবং প্রস্থ ২৪-২৮ সেমি। ফলের আকার ডিম্বাকৃতির, প্রতিটি ফলের ওজন ৮৫০-৯৫০ গ্রাম, ফলের দৈর্ঘ্য ১৩-১৫ সেমি ও প্রস্থ ৯-১১ সেমি। ফলে শাঁসের পুরুত্ব ২ সেমি, শাঁসের রং গাঢ় কমলা, ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৫০০-৫৩০টি, সদ্য

সংগৃহীত বীজের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম, শুকনা শত বীজের ওজন ১.০-১.২ গ্রাম। বীজ ডিম্বাকৃতির এবং বীজের রং ভেলভেট কালো হয়।

জাতটি প্রায় সারা বছরই ফল দিয়ে থাকে এবং রোপণের ৮-৯ মাসের মধ্যে পাকা ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৬০ টন। উৎকৃষ্ট মানের সবজি হিসেবে সারাদেশে কাঁচা ফলের চাহিদা আছে। তাই শাহী পেঁপের চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

পেঁপের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়। তবে উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

বীজের হার

দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ চারার প্রয়োজন হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করা যায়।

চারা তৈরি

বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা হয়। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫ × ১০ সেমি আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন হলে ২-৩টি বীজ বপন কতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই পেঁপের জন্য নির্বাচিত জমি হতে হবে জলাবদ্ধতামুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত। জমি বার বার চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে তৈরি করতে হবে। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে বেড পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া এবং ২০-২৫ সেমি গভীর নালা থাকবে। নালাসহ প্রতিটি বেড ২ মিটার চওড়া এবং জমি অনুযায়ী লম্বা হবে।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে বেডের মাঝ বরাবর ২ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত প্রতি ১৫ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২০ গ্রাম বরিক এসিড এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত পূরণ করে সেচ দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণের সময়

আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাস পেঁপের বীজ বপনের উত্তম সময়। বপনের ৪০-৫০ দিন পর চারা রোপণের উপযোগী হয়।

চারা রোপণ

চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি উলট-পালট করে নিতে হয়। প্রতি গর্তে ৩০ সেমি দূরত্বে ত্রিভূজ আকারে ৩টি করে চারা রোপণ করতে হয়। বীজ তলায় উৎপাদিত চারার উন্মুক্ত পাতাসমূহ রোপণের পূর্বে ফেলে দিলে রোপণকৃত চারার মৃত্যু হার কমবে এবং চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে। পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার ক্ষেত্রে পলিব্যাগটি খুব সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। পড়ন্ত বিকাল চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়া যেন বীজতলা বা পলিব্যাগে মাটির যতটা গভীরে ছিল তার চেয়ে গভীরে না যায়।

গাছে সার প্রয়োগ

ভাল ফলন পেতে হলে পেঁপেতে সময়মত সার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি হিসেবে গাছপ্রতি ৪৫০-৫০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৪৫০-৫০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের এক মাস পর হতে প্রতি মাসে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসার পর এই মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পরিচর্যা

পেঁপের জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে আগাছা দমন করতে গিয়ে মাটি যাতে বেশি আলগা হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ

শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সেচ দিতে হবে। সেচে ও বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

অতিরিক্ত গাছ অপসারণ

চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর গাছে ফুল আসলে প্রতি গর্তে একটি করে সুস্থ সবল স্ত্রী গাছ রেখে বাকিগুলো তুলে/কেটে ফেলতে হবে। তবে সুষ্ঠু পরাগায়ন ও ফল ধারণের জন্য বাগানের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে শতকরা ৫টি পুরুষ গাছ থাকা অপরিহার্য।

ফল পাতলাকরণ

পেঁপের অধিকাংশ জাতের ক্ষেত্রে একটি পত্রকক্ষ থেকে একাধিক ফুল আসে এবং ফল ধরে। ফল কিছুটা বড় হওয়ার পর প্রতি পত্রকক্ষে সবচেয়ে ভাল ফলটি রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী বছরে যে পেঁপে হয় সেগুলো খুব ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকে। ফলে ঠিকমত বাড়তে পারে না এবং এদের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ছোট ফলগুলো ছাঁটাই করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

চারা ঢলে পড়া (ড্যাম্পিং অফ) ও কাণ্ড পচা রোগ দমন

পেঁপের ঢলে পড়া রোগে বীজতলায় প্রচুর গাছ মারা যায়। তাছাড়া এ রোগের জীবাণুর আক্রমণে বর্ষা মৌসুমে কাণ্ড পচা রোগও হয়ে থাকে। *পিথিয়াম এ্যাফানিডারমাটাম* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। বর্ষা মৌসুমে ঢলে পড়া রোগের প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে অথবা সেচের পানিতে এ রোগের জীবণু ছড়ায়।

প্রতিকার

- এ রোগ প্রতিকারের তেমন সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা উত্তম।

- আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে বীজতলা তৈরি করতে হলে বীজ বপনের পূর্বে বীজতলার মাটি ভালভাবে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক ২-৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- জমি তৈরির পর ৬ সেমি পুরু করে শুকনো কাঠের গুঁড়া বা ধানের তুষ বীজতলায় বিছিয়ে পোড়াতে হবে। পরে মাটি কুপিয়ে বীজ বপন করতে হবে।
- বীজতলায় হেক্টরে ৫ টন হারে আধাপচা মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে ১৫-২১ দিন জমিতে বিষ্ঠা পচানোর পর বীজ বপন করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে সিকিউর মিশিয়ে ড্রেঞ্চিং করে এ রোগের বিস্তার কমানো যায়।
- চারা লাগানোর ৩ সপ্তাহ পূর্বে হেক্টরপ্রতি ৩ টন আধা পচা মুরগির বিষ্ঠা অথবা ৩০০ কেজি খৈল জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। এতে কাণ্ড পচা রোগের উপদ্রব কম হবে।

মিলি বাগ

সাম্প্রতিক সময়ে মিলি বাগ পেঁপের একটি মারাত্মক পোকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আক্রান্ত পাতা ও ফলে সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফলে শুঁটি মোল্ড রোগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ মারা যেতে পারে।

মিলি বাগ রোগাক্রান্ত গাছ

প্রতিকার

- আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কাণ্ড সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে অথবা পুরাতন টুথ ব্রাশ দিয়ে আঁচড়িয়ে পোকা মাটিতে ফেলে মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আনারস

বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। বাংলাদেশে প্রায় ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে আনারসের চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন ২ লক্ষ ২৯ হাজার টন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৫ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইল জেলায় আনারসের ব্যাপক চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও আনারসের চাষাবাদ হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আনারস ভিটামিন 'এ', 'বি', ও 'সি' এর একটি উত্তম উৎস।

আনারস

আনারসের জাত

হানিকুইন

পাকা আনারসের শাঁস হলুদ বর্ণের হয়। চোখ সুচালু ও উন্নত। গড় ওজন ১ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট ও পাটল বর্ণের। হানিকুইন সবচেয়ে মিষ্টি আনারস। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন।

সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

হানিকুইন জাতের আনারস

জায়েন্ট কিউ (কেলেঙ্গা)

বাংলাদেশে আবাদকৃত আনারসের মধ্যে জমি এবং উৎপাদনের দিক থেকে জায়েন্ট কিউ জাতটির অবস্থান সবার উপরে। পাকা আনারস সবুজাভ ও শাঁস হালকা হলুদ। চোখ প্রশস্ত ও চেপ্টা। গড় ওজন ২ কেজি।

গাছের পাতা সবুজ, প্রায় কাঁটাবিহীন। ফল খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার ও টাঙ্গাইল জেলায় এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়।

জায়েন্ট কিউ জাতের আনারস

ঘোড়াশাল

পাকা আনারস লালচে এবং ঘিয়ে সাদা হয়। চোখ প্রশস্ত এবং গড় ওজন ১.২৫ কেজি। পাতা কাঁটাবিশিষ্ট, চওড়া ঢেউ খেলানো থাকে। ঢাকা ও নরসিংদী জেলায় এ জাতটির চাষ সীমাবদ্ধ। সঠিক পরিচর্যার অভাব এবং অন্যান্য ফসলের চাপে এ জাতের আওতাধীন জমি দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

জলঢুপি

পাকা অনারস লালচে ও ঘিয়ে সাদা রঙের হয়ে থাকে এবং চোখ প্রশস্ত। গড় ওজন ১.০-১.৫ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট, চওড়া ও ঢেউ খেলানো থাকে। কোন কোন দেশে এগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

জলঢুপি জাতের আনারস

আনারসের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জমি তৈরি

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও জমি সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে।

চারা রোপণ

মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস) আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি মাস) পর্যন্ত চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ
পচা গোবার	২৯০-৩১০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০-৩৬ গ্রাম
টিএসপি	১০-১৫ গ্রাম
এমপি	২৫-৩৫ গ্রাম
জিপসাম	১০-১৫ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে আনারস পাকে।

ফলন

প্রতি হেক্টর জমিতে হানি কুইন আনারস ২৫-৩০ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন হয়।

হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে যে পরিমাণ আনারস উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে আহরিত হয়ে থাকে। এ সময়ে অন্যান্য ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁয়ারা, জাম প্রভৃতি ফলেরও মৌসুম। কাজেই এ সময় আনারসের দাম কমে যায়। এমনকি এক সময়ে প্রচুর পরিমাণ আনারস পাকার ফলে এবং বৃষ্টির দিনে পরিবহনের অভাবে অনেক ফল পচে যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা বেশি থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন না থাকাতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। ফলে দামও বেড়ে যায়। এতে অমৌসুমে জনসাধারণ আনারস খেতে পারে না। হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়া আনারসের জমিতে সব গাছে এক সাথে ফুল/ফল আসে না। যার দরুণ দীর্ঘদিন যাবৎ জমি আটকে থাকে। এতে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাসপায় ও ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। হরমোন প্রয়োগে প্রায় শতভাগ গাছে একসাথে ফুল আসে। হানিকুইন জাতের আনারস একটি রপ্তানিযোগ্য ফল। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী এক কেজি অথবা অর্ধ কেজি ওজনের ফল উৎপাদন করা আবশ্যক। চারার নয় মাস বয়স অথবা ২২ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করা হলে ফল হবে আধা কেজি ওজনের। আবার চারার ১৩ মাস বয়স অথবা ২৮ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করা হলে ফল হবে এক কেজি ওজনের।

হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি

আনারস চারা রোপণের ৯-১৩ মাস পর প্রতি মাসে বৃষ্টিহীন দিনে ক্রমানুসারে ইথ্রেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০০০০ পিপিএম (বা ১%) দ্রবণ প্রতি গাছে ৫০ মিলি পরিমাণে সকালে গাছের কাণ্ডে ঢেলে দিতে হবে। হরমোন প্রয়োগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। সারা বছর আনারস পেতে হলে জমিকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে প্রতি মাসেই এক একটি ব্লকে আনারস চারা রোপণ করতে হয় অথবা একবার রোপণ করে ৩-৪টি ব্লকে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিমাসে হরমোন প্রয়াগ করা যেতে পারে। হরমোন প্রয়োগের ২০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসে এবং ৫-৬ মাস পর ফল আহরণ করা যায়।

মুকুট ব্যবস্থাপনা

ফলের মুকুট থাকা আবশ্যক। কিন্তু বৃহৎ মুকুট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফুল আসার ৬৫-৭৫ দিন পর মুকুটের কেন্দ্রীয় মেরিস্টেম লোহার তৈরি অগারের সাহায্যে অপসারণ করা হলে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত না করে মুকুট ক্ষুদ্র থাকবে।

আনারস বাগান

পেঁয়ারা

পেঁয়ারা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফল জন্মে থাকে। তবে ইতোপূর্বে পেঁয়ারার বাণিজ্যিক চাষ পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি, চট্টগ্রাম জেলার কাঞ্চননগর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার মুকুন্দপুর প্রভৃতি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত জাত যেমন- কাজী পেঁয়ারাসহ 'বারি পেঁয়ারা-২' ও 'বারি পেঁয়ারা-৩' উদ্ভাবিত হওয়ার পর দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে পেঁয়ারার চাষ হচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে পেঁয়ারার মোট উৎপাদন ১ লক্ষ ৬১ হাজার মেট্রিক টন। বহুবিধ গুণাগুণের সমন্বয়ের জন্য পেঁয়ারাকে নিরক্ষীয় এলাকার আপেল বলা হয়। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও এ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জ্যাম, জেলী, জুস প্রভৃতি খাদ্য তৈরি হয়।

পেঁয়ারা বাগান

পেঁয়ারার জাত

কাজী পেঁয়ারা

কাজী পেঁয়ারা

কাজী পেঁয়ারা নামক জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ১৯৮৫ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ আকারে মধ্যম। বীজের গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যে ফল দিতে শুরু করে। এ জাতটি বছরে দু'বার ফল দেয়। প্রথমবার মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-আষাঢ় থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুলাই-আগস্ট) মাসে পাকে। দ্বিতীয়বার মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে পাকে। ফল আকারে বেশ বড়। ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পরিপক্ক ফল হলুদাভ সবুজ এবং ভিতরের শাঁস সাদা। প্রতি ফলে ৩৪০-৩৬০টি বীজ থাকে, বীজ বেশ শক্ত। হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৪.০ গ্রাম।

কাজী পেঁয়ারা খেতে সামান্য টক (ব্রিক্সমান ৮-১৩%)। ফল ৭-১০ দিন সাধারণ তাপমাত্রায় ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। কাজী পেঁয়ারার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৮ টন।

বারি পেঁয়ারা-২

বারি পেঁয়ারা-২

'বারি পেঁয়ারা-২' নামে উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ ছাতাকৃতি ও কাজী পেঁয়ারার চেয়ে খাটো হয়। পাতার অগ্রভাগ সুচালো। জাতটি বর্ষাকালে ও শীতকালে ২ বার ফল দেয়। তবে সঠিক পরিচর্যা (বিশেষ করে ফল পাতলা করা ও

সার প্রয়োগ) করা হলে প্রায় সারা বছর ফল দিতে পারে। ফল আকারে বেশ বড়, ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম ও গোলাকার। পরিপক্ক ফল হলুদাভ সবুজ এবং ভিতরের শাঁস সাদা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ টন।

প্রতি ফলে ৩৩০-৩৫০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। পেঁয়ারা খেতে কচকচে, সুস্বাদু ও মিষ্টি (১০% ব্রিক্স)।

বারি পেঁয়ারা-৩

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে 'বারি পেঁয়ারা-৩' নামে একটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়।

এটি লাল শাঁস বিশিষ্ট পেঁয়ারার প্রথম অনুমোদিত জাত। ফলের আকার ৬.৭৫ × ৭.১০ সেমি। ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম এবং টিএসএস ৮%। ফলের গাত্র মসৃণ, পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় হলদে সবুজ, শাঁস লাল, বীজ মধ্যম। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি পেঁয়ারা-২

পেঁয়ারার উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

পেঁয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রায় সব রকমের মাটিতেই পেঁয়ারার চাষ করা যায়, তবে জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেঁয়ারা ভাল জন্মে। ৪.৫-৮.২ অম্লক্ষারত্বের মাটিতে এটা সহজে জন্মে।

বংশ বিস্তার

বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা সবচেয়ে সহজ। বীজের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ প্রায় হুবহু বজায় থাকে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করলে সে গাছের পেঁয়ারা মাতৃ গাছের পেঁয়ারা হতে পার্থক্য হয় না। তাই ফল উৎপাদনের জন্য বীজের চারা এবং বীজ উৎপাদনের জন্য (মাতৃ গাছ) অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করাই উত্তম। অঙ্গজ পদ্ধতির মধ্যে গুটি কলমই বহুল প্রচলিত।

গর্ত তৈরি ও চারা/কলম রোপণ

এক বছর বয়সের চারা বা কলম সাধারণত ৪-৬ মিটার দূরে দূরে লাগানো হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পেঁয়ারার চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই পেঁয়ারার চারা/কলম রোপণ করা চলে। চারা লাগাবার জন্য ৬০ × ৬০ × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি পুণরায় উলটপালট করে এর ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারাটি লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে তিন কিস্তিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যতদূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। নিচের ছকে বিভিন্ন বয়সের গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স		
	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬ বছর বা তদুর্ধ
গোবর (কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
এম পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০

সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি আসার সময় পানি সেচ অত্যাবশ্যক। গাছের গোড়া থেকে মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করা ও গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দেয়া দরকার।

সেচ ব্যবস্থাপনা

পেঁয়ারার চারা রোপণের সময় যদি গর্তের মাটি শুকনো থাকে তাহলে চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে কিছু পানি দিতে হবে। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় পেঁয়ারা গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি সেচের প্রয়োজন। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে বড় আকারের ফল ও বেশি ফলন পাওয়া যাবে। গোড়ায় পানি জমে গেলে ও ঠিকমত নিষ্কাশন না হলে গাছ মরে যেতে পারে।

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

অঙ্গ ছাঁটাই: অঙ্গ ছাঁটাই বলতে মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করা বুঝায়। রোপণকৃত চারা বা কলমের সুন্দর কাঠামো দেওয়ার নিমিত্তে মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে গোড়ার দিকের সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ডাল নুয়ে দেয়াঃ পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এজন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল ছাঁটাইকরণঃ কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। ফল আকারে বেশ বড় হওয়ায় গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফল ছোট থাকা অবস্থায় (মার্বেল অবস্থা) ৫০-৬০% ফল ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল ছাঁটাই করে প্রায় সারাবছর 'কাজী পেয়ারা' ও 'বারি পেয়ারা-২' জাতের গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফল ঢেকে দেওয়া (Fruit bagging): পেয়ারা ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকা, পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং আকর্ষণীয় রঙের হয়। ব্যাগিং বাদামী কাগজ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগে না বিধায় ফলে কোষ বিভাজন বেশি হয় এবং ফল আকারে বড় হয়। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি হারে টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন

পেয়ারা গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। *কলেটোট্রিকাম সিডি* নামক ছত্রাক পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। প্রথমে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফল পরিপক্ক হলে অনেক সময় ফেটে যায়। তাছাড়া এ রোগে আক্রান্ত ফলের শাঁস শক্ত হয়ে যায়।

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত ফল

গাছের পরিত্যক্ত শাখা-প্রশাখা, ফল এবং পাতায় এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে। বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে পেঁয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে ফুল ধরার পর টপসিন-এম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ দমন

ফিউজেরিয়াম নামক মাটি বাহিত ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছই ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে মারা যায়।

উইল্ট রোগে আক্রান্ত গাছ

প্রতিকার

- এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাই একে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাঠে/বাগানে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমন- এল ৪৯ ও পলি-পেঁয়ারার সাথে কলম করে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
- বাগানের মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ কমানোর জন্য চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সাদা মাছি পোকা দমন

সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়। এরা পাতার রস শুষে গাছকে দুর্বল করে। রস শোষণের সময় পাতায় মধু সদৃশ বিষ্ঠা ত্যাগ করে যার উপর শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান বা ২ মিলি রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি আক্রান্ত পাতা

কুল

স্বাদ ও পুষ্টিমূল্যের বিচারে কুল বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কুলের চাষ হয় তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুল চাষ হয়।

বাংলাদেশে কুলের মোট উৎপাদন প্রায় ৭২ হাজার টন। উল্লেখ্য কুল যখন পাকে তখন অন্যান্য অনেক ফলই পাওয়া যায় না। কুল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' এর একটি ভাল উৎস।

কুল সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। কুল দিয়ে সুগন্ধি চাটনি, আচার ও অন্যান্য মুখরোচক খাবারও তৈরি করা যায়।

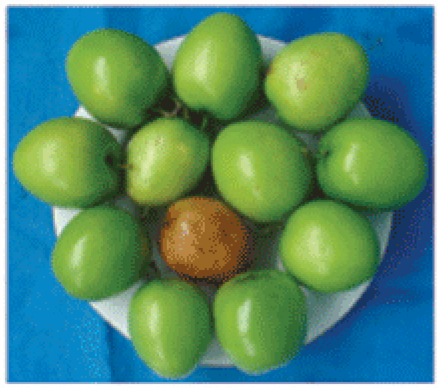

কুল

কুলের জাত

বারি কুল-১

'বারি কুল-১' নামে জাতটি বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ২০০৩ সালে অনুমোদিত হয়। এটি নারিকেলী জাত নামে পরিচিত। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত জাত।

বারি কুল-১

ফল আকারে মাঝারী, ওজন ২৩ গ্রাম ও লম্বা (Oblong)। কুল খেতে খুব মিষ্টি, কচকচে ও সুস্বাদু। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২% এবং টিএসএস ১২.৮%। বীজ ছোট এবং বীজের অগ্রভাগ সুচালো (Pointed)। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ১০-১৫ টন।

বারি কুল-২

'বারি কুল-২' নামে এ জাতটি বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবিত একটি উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উত্তম। তবে দেশের অন্যত্র চাষ করা যায়।

ফল আকারে বেশ বড় ও ডিম্বাকৃতির (Oval shaped), খেতে সুস্বাদু। ফলের খোসা পাতলা, পাকার পর হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১% এবং ব্রিক্সের পরিমাণ ১১.৫%। বীজের আকার ছোট এবং ডিম্বাকৃতির। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৮-২০ টন।

বারি কুল-২

বারি কুল-৩

উচ্চ ফলনশীল জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি কুল-৩' নামে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। এর গাছ খাটো ও ছড়ানো প্রকৃতির। ডাল অল্প কাঁটা বিশিষ্ট। ফল আহরণের সময় মধ্য-মাঘ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২-২৫ টন। ফল বড়, প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের । প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫ গ্রাম, বীজ ছোট। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৬%। শাঁস সাদা, কচকচে, কষ্টিভাব বিহীন, রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১৪%)।

জাতটি সমগ্র বাংলাদেশে চাষোপযোগী। কুলের উৎপাদন, অমৌসুমে ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে এবং ভিটামিন 'সি' এর ঘাটতি হ্রাসে জাতটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে।

বারি কুল-৩

বারি কুল-৪

টক-মিষ্টি উভয় স্বদযুক্ত কুল বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি কমপ্লেক্স' ও ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও শুকিয়ে সংরক্ষণ, আচার তৈরি ও ব্যাঞ্জন রান্নায় টকের উৎস হিসেবে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। শীতকালে দেশীয় ফলের অপ্রতুলতার সময় এদেশে ফলের চাহিদা পূরণে কুল বিশেষ ভূমিকা রাখে। বসত বাড়ি, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়েই এর চাষ সীমাবদ্ধ।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুলের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে এবং বেশ কিছু এলাকায় এটি একটি লাভজনক ফসল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কুলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি কুল-৪' নামে কুলের একটি নতুন জাত উদ্ভাকন করেছে।

বারি কুল-৪

কুলের উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কুল চাষের জন্য সর্বোত্তম। এতে কুলের ফলন ও গুণগতমান দুই-ই ভাল হয়। তবে কুলের পরিবেশ উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটি কুল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে সব ধরনের মাটিতেই কুলের চাষ করা যায়। অন্যান্য প্রধান ফল ও ফসলের জন্য উপযোগী নয় এ ধরনের অনুর্বর জমিতে এমনকি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে কুলের চাষ করা সম্ভব।

বংশ বিস্তার

দু'ভাবে বংশ বিস্তার করা যায়ঃ বীজ থেকে এবং কলম তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। বীজ থেকে চারা পেতে হলে বীজকে ভিজা গরম বালির ভেতর দেড় থেকে দুই মাস রেখে দিলে চারা তাড়াতাড়ি গজাবে, না হলে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। অন্যদিকে, কলমের চারা পেতে হলে নির্বাচিত স্থানে বীজ বপন ও চারা তৈরি করে তার উপর 'বাডিং' এর মাধ্যমে কলম করে নেয়াই শ্রেয়। বলয় (Ring), তালি (Patch) অথবা T-বাডিং যে কোন পদ্ধতিতেই বাডিং করা যায়। তালি, চোখ কলম অপেক্ষা সহজ। বাডিং করার জন্য চারার রুটস্টক বয়স ৩ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য-চৈত্র থেকে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) বাডিং করার উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে সায়ন (Scion) সংগ্রহের উদ্দেশে নির্বাচিত জাত এবং রুটস্টক উভয়েরই পুরানো ডাল-পালা ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে ছাঁটাই করে দিতে হয়। অতঃপর নতুন শাখাকে বাডিং-এর কাজে লাগাতে হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটির আকারের গর্ত তৈরি করতে

হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে ।

সার প্রয়োগ

সুষ্ঠ বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা।

গাছের বয়স	গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৪ বছর	১৫	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬ বছর	২০	৭৫০	৭০০	৭০০
৭-৮ বছর	২৫	১০০০	৮৫০	৮৫০
৯ বা তদুর্ধ	৩০	১২৫০	১০০০	১০০০

এছাড়া, অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর। সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয়।

পানি সেচ ও পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সেচ দিলে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাই

নতুন রোপণকৃত বা কলমকৃত গাছে আদিজোড় হ'তে উৎপাদিত কুঁশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। কুল গাছে সাধারণত চলতি বছরের নতুন গজানো প্রশাখায় ভাল ফল ধরে। এজন্য প্রতিবছর ফল আহরণের পরপরই ডাল ছাঁটাই আবশ্যক। চারা রোপণের বা কুঁড়ি সংযোজনের পর ৩/৪ বছর মধ্যম ছাঁটাই অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রশাখা এবং শাখার মাথার দিক থেকে ৫০-৬০ সেমি পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে। গাছ কাঙ্ক্ষিত আকারে আসার পর এক বছর বয়সী ডাল গোড়ার দিকে ২০-৩০ সেমি পরিমাণ রেখে সম্পূর্ণ ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এছাড়া মরা, দুর্বল, রোগাক্রান্ত এবং এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ডালও ছেঁটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

জাত অনুসারে মধ্য-পৌষ থেকে মধ্য-চৈত্র (জানুয়ারি থেকে মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। অপরিপক্ক ফল আহরণ করা হলে তা কখনই কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন হবে না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম এবং মলিন বর্ণের হয়ে যায়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুণ কমে যায় এবং ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌছবে তখন কুল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী।

অন্যান্য পরিচর্যা

কুল গাছের পাউডারী মিলডিউ রোগ দমন

কুলের পাউডারী মিলডিউ একটি মারাত্মক রোগ। ফলন হ্রাস পায়। ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং অন্যান্য পোষক উদ্ভিদে এ রোগের জীবণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। উষ্ণ ও ভিজা আবহাওয়ায় বিশেষ করে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিওভিট, সালফোলাক বা কুমুলাস ডিএফ নামক ছত্রাক-বারক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১০- ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কুলে বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ

লিচু

লিচু

লিচু গন্ধ ও স্বাদের জন্য দেশ-বিদেশে বেশ জনপ্রিয়। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে লিচুর মোট উৎপাদন ৫৫ হাজার টন। লিচু টিনজাত করে সংরক্ষণ করা যায়।

লিচুর জাত

বারি লিচু-১

বারি লিচু-১

'বারি লিচু-১' উচ্চ ফলনশীল জাতটি চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

ফল ডিম্বাকার এবং রং লাল। ফলের ওজন প্রায় ১৮-২০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য ৩.৫ সেমি এবং প্রস্থ ৩.১ সেমি হয়ে থাকে। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৬৫.৩%। প্রতি গাছে ৮-১০ হাজার ফল উৎপাদিত হতে পারে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

সাধারণত মধ্য-মাঘ মাসে (জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ) কুঁড়ি আসতে শুরু করে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ফল আহরণ শেষ হয়ে যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ জাতটি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বারি লিচু-২

'বারি লিচু-২' নামে উচ্চ ফলনশীল নাবী জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতা বর্শাকৃতির, পুষ্পমঞ্জরী পিরামিড আকৃতির ও ফল গোলাকার। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৩.৪ সেমি এবং প্রস্থ ৩.০ সেমি। পাকা ফলের রং গোলাপী লাল। প্রতিটি ফলের ওজন ১৪-১৭ গ্রাম, ফলের শাঁস মাংসল, রসালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৬.১%) এবং শাঁস ফলের ৬৫-৭০%।

বীজ অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতিবছর নিয়মিত ফল দেয়। ফুল মাঘের মাঝামাঝী (ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ) সময়ে আসে। জ্যৈষ্ঠের (জুন প্রথম সপ্তাহ) শেষ থেকে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে (মধ্য-জুন) ফল পাকে। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ২৩০০-২৭০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন।

জাতটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে চাষের উপযোগী। লিচু উৎপাদনের মৌসুম খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই লিচুর উৎপাদন মৌসুমকে দীর্ঘায়িত করার জন্য গুরুত্বসহকারে জাতটি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বারি লিচু-২

বারি লিচু-৩

'বারি লিচু-৩' জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ১৯৯৬ সালে মুক্তায়ন করা হয়। 'বারি লিচু-৩' মাঝ মৌসুমী জাত, নিয়মিত ফল ধরে। গোলাপের সুঘ্রাণ বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ফল উৎপাদনকারী এ জাতটি বসত বাড়ির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতা খর্বাকার বর্শাকৃতির হয়। পুষ্পমঞ্জরী পিরামিড আকৃতির, ফল হৃদপিন্ডাকার হয়। ফলের আকৃতি দৈর্ঘ্য ৩ সেমি ও প্রস্থ ৩.৩ সেমি। পাকলে হলদে সবুজ ছোপসহ লাল রং ধারণ করে। ফলের ওজন ১৭-১৯ গ্রাম। ফলের শাঁস মাংসল রসালো ও খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)।

শাঁস ফলের ৭৫-৭৭%, বীজ ক্ষুদ্রাকার এবং মাঘের মাঝামাঝী (ফেব্রুয়ারি) সময় ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝী (জুন) সময় ফল পাকে। প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ১৬০০-২০০০টি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষের উপযোগী।

বারি লিচু-৩

বারি লিচু-৪

'বারি লিচু-৪' জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে এবং জুন মাসে ফল পরিপক্কতা লাভ করে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫০০০টি।

ইহা একটি উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত। গাছপ্রতি ফলন ১৩০ কেজি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১০৩১২টন। বৃহদাকার ও গাঢ় লাল বর্ণের প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৭ গ্রাম।

ফল অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন ও মাংসল। ফল অত্যন্ত মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২%), রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। জাতটি বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি লিচু-৪

বারি লিচু-৫

উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। প্রতিবছর ফল ধরে। ১৫ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ৩৪০০টি ফল ধরে যার ওজন ৭৩.৮ কেজি। ফল খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৭.৫%)। ফল মাঝারি আকৃতির এবং গড় ওজন ২১.৭৯ গ্রাম। ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল গাঢ় লাল রঙের হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ৩য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস গাঢ় সাদা রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৭০ ভাগ। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য উপযোগী। এ জাতের লিচুতে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি লিচু-৫

লিচুর উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

গভীর, নিকাশযুক্ত, উর্বর বেলে অথবা দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি

উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ প্রণালী

সমতল ভূমিতে- বর্গাকার, পাহাড়ী ভূমিতে- কন্টুর।

চারা নির্বাচন

এক থেকে দুই বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাস।

চারা রোপণের দূরত্ব

৮ থেকে ১০ মিটার।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ১ × ১ × ১ মিটার।

গর্তে সারের পরিমাণ

চারা রোপণের ১০৩১৫ দিন পূর্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারর পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম
জৈব/গোবর	২০-২৫ কেজি

গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার অভিযোজন দ্রুত বৃদ্ধি হবে।

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-২০	২০ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	২০০০
টি এস পি (গ্রাম)	৪০০	১২০০	২০০০	৩০০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	১৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৫০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ

চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোঁটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া একান্ত দরকার। অপরদিকে, বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে তার জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

পূর্ণ বয়স্ক গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের জন্য ফল সংগ্রহের পর অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের সময় লিচুর মাকড় আক্রান্ত ডাল ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফল পাকার সময় খোসা আকর্ষণীয় খয়েরী, লাল বা সবুজ মিশ্রিত লাল রং ধারণ করে ও খোসার কাটাগুলি চেপ্টা হয়ে সমান হয়ে যায়। মঞ্জরীর গোড়া থেকে পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে থোকায় থোকায় লিচু সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির পর পরই গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ এতে ফল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল সংগ্রহের সময় ফলবান ও ফল বিহীন বিশেষ করে লিচু মাকড়াক্রান্ত পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে দিতে হয়। যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচু গাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচু গাছ থেকে বছরে ৫০০০-১০০০০ (১০০-১৫০ কেজি) লিচু সংগ্রহ করা যায়।

লিচু রপ্তানি প্রযুক্তি

লিচু রপ্তানির জন্য এর গুণগতমান ভাল হওয়া দরকার। সেজন্য উৎপাদন এবং শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করা দরকার। নিচে রপ্তানির জন্য উৎপাদন ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি দেয়া হলো।

লিচু উৎপাদন প্রযুক্তি

বোরন ও দস্তার অভাব থাকলে অন্যান্য অনুমোদিত সারের সাথে প্রতিটি গাছে ২০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট এবং ১০ গ্রাম বরিক এসিড (লিচুর আঁটি শক্ত হওয়ার পর্যায়ে) গাছের গোড়ায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত নিয়মিত রিং বেসিন পদ্ধতিতে গাছের গোড়ায় সেচ দিতে হবে। লিচুর পোকা দমনের জন্য ফল মটর দানার আকার হলে নাইলনের তৈরি জাল দিয়ে লিচুর গোছা বেঁধে দিতে হবে।

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

রপ্তানিযোগ্য লিচু

লিচু পাকার পর পাতা ও বোঁটাসহ সম্ভব হলে কাচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। নষ্ট ও কাঁচা লিচু বাদ দিয়ে ভালো মানের ফল গোছা আকারে ঝুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ পাতা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোল্ড স্টোরেজের প্যাকিং কক্ষে আনতে হবে। এখানে আর একবার ফল বাছাই করতে হবে। ফলর সাথে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার বোঁটা রেখে ছিদ্রযুক্ত পলিইথাইলিন ব্যাগে করোগেটেড ফাইবার কার্টুনে ভরে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২৪ ঘন্টা রাখতে হবে। এভাবে ১ কেজি লিচুর জন্য ৪টি ব্যাগের প্রয়োজন। তারপর কার্টুনগুলো ঠাণ্ডাযুক্ত গাড়িতে করে রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে পাঠাতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল ছিদ্রকারী পোকা লিচুর অন্যতম প্রধান শত্রু। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বোঁটার নিকট দিয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এতে অনেক অপরিপক্ক ও পরিপক্ক ফল ঝরে যায়। এছাড়া, বীজ খাওয়ার দরুণ করাতের গুড়ার মত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং বোঁটার কাছে জমে থাকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

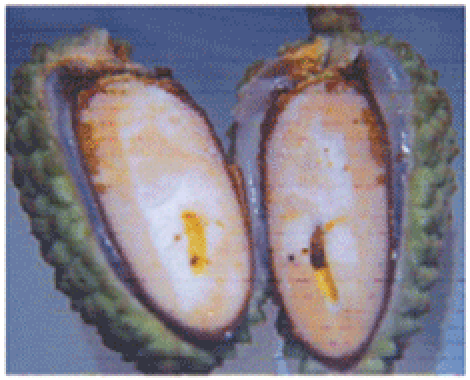

লিচুর ভিতরে ফল ছিদ্রকারী পোকা

দমন ব্যবস্থা

বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য রিপকর্ড/সিমবুশ/সুমিসাইডিন/ডেসিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে শেষ স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়

লিচু গাছের পাতা, ফুল ও ফলে এর আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং এর নিচের দিকে লাল মখমলের মত হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে মরে যায়। আক্রান্ত ডালে ফুল, ফল বা নতুন পাতা হয় না এবং আক্রান্ত ফুলে ফল হয় না।

মাইট আক্রান্ত লিচুর পাতা

দমন ব্যবস্থা

ফল সংগ্রহের সময় মাকড় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মাকড় নাশক ভারটিম্যাক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে নতুন পাতায় ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাদুর

লিচুর প্রধান শত্রু বাদুর। এরা পরিপক্ক ফলে আক্রমণ করে। ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক রাতের অসাবধানতায় এরা সমস্ত ফল বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। মেঘলা রাতে বাদুরের উপদ্রব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

দমন ব্যবস্থা

বাদুর তাড়ানোর জন্য রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত গাছ জালের সাহায্যে ঢেকে দিয়েও বাদুরের আক্রমণ রোধ করা যায়। বাগানে গাছের উপর দিয়ে শক্ত ও চিকন সুতা বা তার টাঙ্গিয়ে রাখলে বাদুরের চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হয়।

নারিকেল

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ব্যবহার বৈচিত্র্যে এটি একটি অতুলনীয় উদ্ভিদ। নারিকেল গাছের প্রতিটি অঙ্গই কোন না কোন কাজে লাগে। খাদ্য-পানীয় থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, পশু খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ নারিকেল গাছ থেকে পাওয়া যায়। এজন্য নারিকেল গাছকে স্বর্গীয় বৃক্ষ বলা হয়।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই নারিকেল জন্মায়। তবে উপকূলীয় জেলাসমূহে এর উৎপাদন বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে নারিকেলের বার্ষিক উৎপদান ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের ৩৫-৪০% ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের শাঁসে স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ডাবের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। খাবার স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী।

নারিকেলসহ নারিকেল গাছ

নারিকেলের জাত

বারি নারিকেল-১

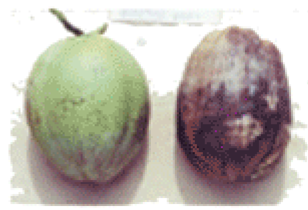

বারি নারিকেল-১

নারিকেলের জাত হিসেবে 'বারি নারিকেল-১' বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম আকৃতির এবং সারা বছর ফল ধরে। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফল ডিম্বাকার এবং পরিপক্ক ফলের ওজন ১২০০-১৩০০ গ্রাম। প্রতিটি নারিকেলের খোসার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পানির পরিমাণ ২৭০-২৯০ মিলি। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম এবং শাঁসের পুরুত্ব ৯-১১ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%। এ জাতটি কাণ্ড ঝরা রোগ সহনশীল। দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি নির্বাচন করা হয়। জাতটি দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি নারিকেল-১ এর ফলসহ গাছ

বারি নারিকেল-২

বারি নারিকেল-২

বিদেশ থেকে প্রবর্তিত 'বারি নারিকেল-২' জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। নারিকেলের এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা সারা বছর ফল দেয়।

পূর্ণ বয়স্ক গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফলের আকৃতি প্রায় ডিম্বাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ১.৫-১.৭ কেজি ও পানির পরিমাণ ৩৩০-৩৪৫ মিলি। ফলে শাঁসের পুরুত্ব ১০-১২ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%।

পাতার দাগ রোগ সহনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষের উপযোগী। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এ জাত বেশি উপযোগী।

বারি নারিকেল-২ এর ফলসহ গাছ

নারিকেলের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

নারিকেল গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

রোপণের সময়

মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আশ্বিন (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মাস।

রোপণের দূরত্ব

৬ × ৬ মিটার হিসেবে হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারার প্রয়োজন হয়।

গর্তের পরিমাপ

১ × ১ × ১ মিটার।

সারের পরিমাণ

নিম্নরূপ হারে গর্তে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমওপি	৪০০ গ্রাম
গোবর	২০-৩০ কেজি
জিংক সালফেট	১০০ গ্রাম
বরিক এসিড	৫০ গ্রাম

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

গর্তের মাঝখানে নারিকেল চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চারার গোড়ার অংশ মাটির উপরে থাকে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রোপণের পর চারায় খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানি দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

নারিকেল গাছে প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। অন্যান্য সারের তুলনায় নারিকেল গাছে পটাশ জাতীয় সারের মাত্রা বেশি লাগে। এ সারের অভাবে ফল দেরিতে আসে, ফুল ঝরে যায় ও রোগের প্রকোপ বাড়ে। প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৮০০	১০০০	১২০০	১৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১০০	২০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	৪০০	৮০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	৪০	৬০	৮০	১০০	১৫০	২০০
বরিক এসিড (গ্রাম)	১০	১৫	২০	৩০	৪০	৫০

দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে অর্ধেক সার মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি অর্ধেক সার মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে গাছের গোড়া থেকে চতুর্দিকে ১.০ মিটার জায়গা বাদ দিয়ে ১.০-২.৫ মিটার দূর পর্যন্ত মাটিতে ২০ -৩০ সেমি গভীরে প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পর মাটি কুপিয়ে দিতে হবে। এ সময় মাটিতে রস কম থাকলে অবশ্যই সেচ দেয়া প্রয়োজন। বেশি বৃষ্টিপাত বা বেশি শুষ্কতার সময় সার প্রয়োগ ঠিক হবে না।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

নারিকেল ফসলের উপর সেচ ও নিষ্কাশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে সঠিকভাবে সেচ দিলে ফলন ৭৫% পর্যন্ত বেড়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর এবং গাছে সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হবে। বেসিন এবং প্লাবন এ দুই পদ্ধতির সাহায্যে সেচ প্রদান করা যায়। তবে প্লাবন পদ্ধতিতে ফলন ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যেন পানি দাঁড়াতে না পারে তার জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা দরকার।

গাছ পরিষ্কার করা বা ঝুরানো

নারিকেল গাছের তাজা পাতা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়বে। তবে গাছের মাথায় অতিরিক্ত ময়লা-আবর্জনা জমলে বা গণ্ডার পোকায় আক্রান্ত হলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের দেশে নারিকেল উৎপাদিত এলাকায় বছরে একবার নারিকেল গাছ ঝুরানোর প্রচলন রয়েছে এবং অনেকেই তা আবশ্যক মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা গাছ ঝুরানোর কাজ করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফল সংগ্রহ

ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ৫-৭ মাস বয়সী ফল সংগ্রহ করা হয়। সারা বছরই কম বেশি নারিকেল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরে দু'বার (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) এবং (ভাদ্র-কার্তিক) মাসে বেশির ভাগ গাছ থেকে নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। নারিকেল পরিপক্ক হলে বাদামী রং ধারণ করে এবং ঝাঁকি দিলে পানি নড়ে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বাড রট/কুঁড়ি পচা

ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা প্রথমে বিবর্ণ হয়ে যায় ওপরে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভিতর থেকে বাইরের দিকে বয়স্ক পাতা একের পর এক আক্রান্ত হতে থাকে। আক্রান্ত পাতা আস্তে আস্তে মারা যায় ও এক সময় কেন্দ্রস্থলের সকল পাতার বোঁটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থা গাছটিকে কেন্দ্রস্থলে পাতাশুন্য মনে হয়।

কুঁড়ি পচা রোগাক্রান্ত নারিকেল গাছ

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম সিকিউর মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। এ রোগে আক্রান্ত মৃত প্রায় গাছকে কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফল পচা রোগ

এ রোগের কারণে অপরিপক্ক বা কচি ফল পচে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাদামী রং ধারণ করে এবং ফলের গায়ে সংক্রমিত স্থানে ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকার

প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। রোগের আক্রমণ রোধ করতে হলে গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে।

পাতার ব্লাইট/দাগ পড়া

এ রোগের আক্রমণে পাতায় ধুসর বাদামী বর্ণের কিনারাসহ হলুদ বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ডিম্বাকার ও এক সেমি লম্বা। পরবর্তী সময়ে দাগগুলো ধূসর বর্ণের হয় ও পাতার শিরার সমান্তরাল প্রসারিত হতে থাকে এবং সবশেষে সব দাগগুলো একত্রিত হয়ে পুরো পাতাটাই ছেয়ে ফেলে। চারা এবং ছোট গাছ এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

প্রতিকার

পরিমিত সার প্রয়োগ করলেও যথা সময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রান্ত গাছে ব্যাভিস্টিন/কারবেন্ডাজিম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

রস ঝরা/স্টেম ব্লিডিং

গাছের আক্রান্ত অংশ দিয়ে লালচে বাদামী বর্ণের রস নির্গত হয়। যে স্থান দিয়ে রস গড়িয়ে নামে সে স্থানে রস ঝরার দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। সংক্রমণ স্থানের বাকলও শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং ভিতরে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশ ভালভাবে ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। গাছে গর্ত হয়ে গেলে পিচ বা সিমেন্ট দ্বারা গর্ত পূরণ করে দিতে হবে।

গণ্ডার পোকা

পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথার পাতার কচি অগ্রভাগ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং কচি নরম শাঁস খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত গাছের নতুন পাতা যখন বড় হয় তখন পাতার

আগা কাঁচি দিয়ে কাটার মত দেখায়। কোন কোন সময় পাতার মধ্য শিরাটিও কাটা পড়ে যায়। ফলে পাতাটি ভেঙ্গে পড়ে। আক্রমণ তীব্র হলে নতুন পাতা বের হতে পারে না। এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে গাছ মারা যায়। গাছের নিচে বা আশে পাশে গোবরের ঢিবি থাকলে এ পোকা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার

আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে কীটনাশক প্রবেশ করালে পোকা মারা যাবে। এরপর ছিদ্রটি পুডিং বা কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এ পোকাগুলো পচা আবর্জনা, গোবর, মরা কাঠের গুঁড়িতে প্রজনন ঘটায় ও ডিম পাড়ে। তাই এ সকল প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে।

বন্ধ্যা বা চিটা নারিকেল সৃষ্টি হওয়া

অনেক সময় নারিকেল গাছে বন্ধ্যা বা শাঁসবিহীন ফল উৎপাদিত হয়। বন্ধ্যা ফলের বাইরের খোসা ও খোল স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠে কিন্তু ভিতরের পানি বা শাঁস থাকে না এবং কোন ভ্রূণ থাকে না। কখনও শুধু পানি থাকে কিন্তু শাঁস থাকে না। আবার কখনও আংশিক শাঁস থাকে কিন্তু পানি থাকে না। একে চিটা নারিকেল বলা হয়।

প্রতিকার

বরিক এসিড (৫০ গ্রাম/গাছ) ও এমোনিয়াম মলিবডেট গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। সুষম সার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

কমলা

লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে বাংলাদেশে কমলা সবচেয়ে জনপ্রিয়। জাতটি সুমিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে কমলার চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন ২০৬২ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড় ও পার্বত্য জেলাসমূহে কমলা ভাল জন্মে।

কমলার জাত

বারি কমলা-১

'বারি কমলা-১' জাতটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত খাসী কমলার জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ১৯৯৬ সালে চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়।

'বারি কমলা-১' মাঝারী আকৃতির খাড়া গাছ। পাতা মাঝারী, বল্লাকৃতির। পাতার বোঁটার সাথে ক্ষুদ্র উইং থাকে। এটি একটি নিয়মিত আগাম ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত (গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে)। ফল বড়, ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম ও প্রায় গোলাকৃতির হয়। পাকার পর হলদে রং ধারণ করে। ফলের খোসা ঢিলা, ফল রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলায় চাষোপযোগী।

বারি কমলা-১

বারি কমলা-২

বাংলাদেশের ফলের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। এ কমলা গাছ মধ্যম আকৃতির এবং প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ফল ৭-১২ সেমি আকৃতির প্রায় গোলাকার এবং ফলের গড় ওজন ৩৮ গ্রাম। সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় ফল ও ফলের শাঁস গাড় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২%)। ৩-৪ বছরের প্রতিটি গাছে ১৫-২০টি ফল ধরে। বীজ খুব ছোট আকৃতির। এ জাতের কমলা গাছে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি কমলা-২

কমলার উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদন

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই কমলার বংশ বিস্তার করা যায়। কমলার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। কমলার বীজ থেকে একাধিক চারা পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি যৌন ও বাকিগুলো অযৌন। তুলনামূলকভাবে সতেজ ও মোটা চারাসমূহ অযৌন চারা বা নিউসেলার চারা হিসেবে পরিচিত। গুটি কলম, চোখ কলম ও জোড় কলম এর মাধ্যমে অযৌন চারা উৎপাদন করা যায়। কমলা উৎপাদনের জন্য রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলমকৃত অযৌন চারা উত্তম।

জমি তৈরি

জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটি তুলে পাশে রেখে দিতে হবে। বর্ষার পূর্বে গর্ত মাটি দিয়ে ভর্তি করে রাখতে হবে। কমলা চাষের নির্বাচিত জমি পাহাড়ি হলে সেখানে ৩০-৫০ মিটার দূরত্বে ২-৪টি বড় গাছ রাখা যেতে পারে। তবে বড় গাছ কাটলে শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। তারপর পাহাড়ের ঢাল অনুসারে নকশা তৈরি করে নিতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভূজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। চারা কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ (মে-জুন) মাস কমলার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে যে কোন মৌসুমে কমলার চারা লাগানো যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

সুস্থ সতেজ ১.০-১.৫ বছর বয়সের চারা/কলম সংগ্রহ করে গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়ার মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোঁড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০	২০০	১০০	১৫০
৩-৪	১৫	৩০০	১৫০	২০০
৫-১০	২০	৫০০	৪০০	৩০০
১০ এর অধিক	৩০	৬৫০	৫০০	৫০০

উপরোল্লিখিত সারের অর্ধেক ফল সংগ্রহের পর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বাকি অর্ধেক ফল মার্বেল আকার ধারণ করার পর অর্থাৎ অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। ফলবান গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার নিচের জমি কোদাল দিয়ে হালকা করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত গাছের গোড়ার ৩০ সেমি এলাকায় কোন সক্রিয় শিকড় থাকে না, তাই সার প্রয়োগের সময় এই পরিমাণ স্থানে সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

পানি সেচ ও নিস্কাশন

বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে ২-৩টি সেচ দিলে কমলার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় সেচ দিলে ফলের আকার বড় ও রসযুক্ত হয়। গাছের গোড়ায় পানি জমলে মাটি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ

কমলা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কান্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

আগাছা দমন

আগাছা কমলা গাছের বেশ ক্ষতি করে। গাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গাছের উপরে পরগাছা ও লতাজাতীয় আগাছা থাকলে তা দূর করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা

ফল ভালভাবে পাকার পর অর্থাৎ কমলা বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে। গাছ হতে ফল সংগ্রহের জন্য হারভেস্টার ব্যবহার করা উত্তম। তাজা ফল হিমাগারে সংরক্ষণ করলে ১০° সে. তাপামাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত এবং ৫.৬° সে. তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তাজা ফল সংগ্রহের পর ১৩ শতাংশ তরল মোমের আবরণ দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায়ও ২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

অন্যান্য পরিচর্যা

লিফ মাইনার পোকা

লিফ মাইনার পোকা

এটি লেবু জাতীয় ফসলের অন্যতম মারাত্মক শত্রু। সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গাছে নতুন পাতা গজালে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এ পোকার কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচের সবুজ অংশ খেয়ে আকা-বাঁকা সুড়ঙ্গের মত সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে পাতার কিনারার দিক মুড়ে পুত্তলীতে পরিণত হয়। আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত পাতায় ক্যাঙ্কার রোগ হয়। গাছ দুর্বল হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার

- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মিলি এডমায়ার ২০০ এমএল বা ২ মিলি কিনালাক্স ২৫ ইসি মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার কচি পাতায় স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা

ফলের মাছি পোকা

পূর্ণাঙ্গ পোকা আধা পাকা ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বা কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত স্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মে। আক্রান্ত ফল পচে যায় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। ফল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা মারা যেতে পারে। আগস্ট মাস থেকে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত বাগানে ১০ মিটার অন্তর এ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ

লেবুজাতীয় ফলের নার্সারির জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পচে যায় এবং চারা মরে যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

ড্যাম্পিং অফ রোগে আক্রান্ত চারা

প্রতিকার

বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলায় ঘন করে চারা লাগানো যাবে না।

গ্রীনিং

গ্রীনিং কমলা ও মাল্টা জাতীয় গাছের একটি মারাত্মক ফেস্টিডিয়াস ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ। সাধারণত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণের ন্যায় হলদে ভাব ধারণ করে। পাতার শিরা দুর্বল হওয়া, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো ও পাতার সংখ্যা কমে আসা, গাছ ওপর থেকে নিচের দিকে মরতে থাকা ও ফলের সংখ্যা কমে যাওয়া হলো এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ রোগ সাইলিডবাগ নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা সংক্রমিত হয়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ডাল নিয়ে জোড় কলম, শাখা কলম বা গুটি কলম করলে নতুন গাছেও এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার

মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রয়োগ করে এ রোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাগানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে।

গামোসিস

ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। রোগাক্রান্ত গাছের কাণ্ড ও ডাল বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হতে থাকে। আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ডাল উপর দিক থেকে মরতে থাকে। কাণ্ড বা ডালের সম্পূর্ণ বাকল রিং আকারে নষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়। মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

গামোসিস রোগাক্রান্ত কাণ্ড

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড়/রুট স্টক যেমন- রংপুর লাইম, রাফ লেমন, ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন, কাটা জামির প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা এবং গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। মাটি স্যাঁত স্যাঁতে হতে না দেয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ না দেয়া। আক্রান্ত স্থান ছুঁরি দ্বারা চেছে বর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দেয়া (১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন আলাদা পাত্রে গুলিয়ে পরিমিত পানিতে মিশিয়ে বর্দোপেস্ট তৈরি করতে হবে)।

ক্যাঙ্কার

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। কমলা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের কচি বাড়ন্ত কুঁড়ি, পাতা ও ফলে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। আক্রান্ত পাতার উভয় পাশে খসখসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত অংশের চতুর্দিকে গোলাকার হলুদ কিনারা দেখা যায়। পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে এবং আক্রান্ত ডগা উপর দিক থেকে মরতে থাকে। ফলের উপর আক্রমণ বেশি হলে ফল ফেটে যায় ও ঝরে পড়ে। ঘন ঘন বৃষ্টি হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত বাতাস জনিত কারণে ও লিফ মাইনার পোকার আক্রমণে গাছের ডাল ও পাতায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার ভিতর দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

বৃষ্টির মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বর্দোমিক্সার বা কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে এবং সমগ্র বর্ষা মৌসুমে প্রতি মাসে একবার উল্লিখিত ছত্রাকনাশকগুলোর যে কোন একটি স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত ডাল ও পাতা কেটে ফেলতে হবে এবং বাগানে জমে থাকা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লিফ মাইনার নামক পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে অঞ্চলে বাতাস বেশি হয় সেখানকার বাগানের চারদিকে বাতাস প্রতিরোধক গাছ লাগাতে হবে।

ডাইব্যাক বা আগা মরা রোগ

ডাইব্যাক রোগাক্রান্ত গাছ

কমলা গাছের জন্য এটি অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত রোগাক্রান্ত দুর্বল গাছ এবং মাটিতে রস ও খাদ্যোপাদানের স্বল্পতার জন্য এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

প্রতিকার

পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা যায়। মরা ডাল ২.৫ সেমি সবুজ অংশসহ কেটে ফেলা এবং কর্তিত

অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। বছরে ২/১ বার গাছে কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা প্রয়োজন।

ফলের খোসা মোটা ও রস কম

জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে, দস্তা বা ফসফরাসের ঘাটতি হলে এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করা হলে এ সমস্যা হয়।

প্রতিকার

সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম জিঙ্ক অক্সাইড অথবা ৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার পাতায় ও ফলে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত জাতের চাষ করতে হবে।